॥ ৫০ ॥

উপভাষা

(Dialects)

ভাষার সংজ্ঞায় আমরা বলেছি, ভাষা হচ্ছে কতকগুলি অর্থবহ ধ্বনি-সমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপ যার সাহায্যে একটি বিশেষ সমাজের লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় করে। যে জনসমষ্টি একই ধরনের ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপের দ্বারা নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় করে ভাষাবিজ্ঞানীরা তাকে একটি ভাষা-সম্প্রদায় (Speech Community) বলেন : "A Group of people who use the same system of speech signals is a *speech community*."[৬৫] যেমন একটি ধ্বনিসমষ্টি ধরা যাক—'আমরা বই পড়ি'।

এখানে যে নির্দিষ্ট ধ্বনিসমষ্টি দিয়ে একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, সেই ধ্বনিসমষ্টি এই নির্দিষ্ট ক্রমে বিন্যস্ত করে শুধু বাঙালীরাই ব্যবহার করে এবং এর দ্বারা যে ভাব প্রকাশিত হয় তা শুধু বাঙালীরাই বুঝতে পারে। সুতরাং বাঙালীদের একটি ভাষা-সম্প্রদায় (Speech Community) বলতে পারি। এই একই ভাব প্রকাশের জন্যে আবার অন্য ভাষা-সম্প্রদায় অন্য ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার করবে।

এক্ষেত্রে ইংরেজরা যে ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার করবে তা হল—We read books. জার্মানরা এক্ষেত্রে বলবে—Wir lesen Bücher. ফরাসীরা বলবে—Nous lisons des livres. হিন্দী ভাষীরা বলবে—হম কিতাব পড়তে হৈঁ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে একই ধরনের ধ্বনিসমষ্টি দিয়ে সব মানুষের কাজ চলে না। এক-এক ধরনের ধ্বনিসমষ্টি ও ধ্বনিসমাবেশ-বিধিতে এক-একটি জনগোষ্ঠী অভ্যস্ত। অর্থাৎ এক-একটি ভাষা এক-একটি জনসমষ্টির নিজস্ব প্রকাশ-মাধ্যম। এক-একটি বিশিষ্ট ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধরূপের ব্যবহারকারী জনসমষ্টিই হল এক-একটি ভাষা-সম্প্রদায়। কিন্তু এক-একটি ভাষা-সম্প্রদায় যে ভাষার মাধ্যমে ভাববিনিময় করে, সেই ভাষারও রূপ সর্বত্র সম্পূর্ণ একরকম নয়। যেমন, পূর্ব বাংলা ('বাংলা দেশ') এবং পশ্চিম বাংলায় বাংলা ভাষাই প্রচলিত, কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উচ্চারণ ও ভাষারীতি

৬৫। Bloomfield, Leonard : *Language*. Delhi : Motilal Banarsidass, 1963, p. 29.

পুরোপুরি একরকম নয়। একই ভাষার মধ্যে এই যে আঞ্চলিক পার্থক্য একে বলে আঞ্চলিক উপভাষা। উপভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—"A specific form of a given language, spoken in a certain locality or geographic area, showing sufficient differences from the standard or literary form of that language, as to pronunciation, grammatical construction and idiomatic usage of words, to be considered a distinct entity, yet not sufficiently distinct from other dialects of the language to be regarded as a different language."[৬৬] অর্থাৎ উপভাষা হল একটি ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ-বিশেষ রূপ যা এক-একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত, যার সঙ্গে আদর্শ ভাষা (standard language) বা সাহিত্যিক ভাষার (literary language) ধ্বনিগত, রূপগত ও বিশিষ্ট বাগ্‌ধারাগত পার্থক্য আছে; এই পার্থক্য এমন সুস্পষ্ট যে ঐসব বিশেষ-বিশেষ অঞ্চলের রূপগুলিকে স্বতন্ত্র বলে ধরা যাবে, অথচ পার্থক্যটা যেন এত বেশী না হয় যাতে আঞ্চলিক রূপগুলিই এক-একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাষা হয়ে উঠে। এই সংজ্ঞায় উপভাষার পরিচয় মোটামুটি ভাবে বোঝা যায় বটে, কিন্তু ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্থক্যটি সুস্পষ্ট হয় না। কারণ ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্থক্যটি চূড়ান্ত নয়, আপেক্ষিক; শ্রেণীগত নয়, মাত্রাগত। একই ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক পৃথক্ রূপকে উপভাষা বলে। কিন্তু এই আঞ্চলিক পার্থক্য বেড়ে চরমে গেলেই আবার একই ভাষা থেকে একাধিক ভাষার জন্ম হয়। অর্থাৎ আঞ্চলিক রূপগুলি তখন একই ভাষার উপভাষা নয়, তখন সেগুলি এক-একটি স্বতন্ত্র ভাষা। যেমন বাংলা ও অসমিয়া ভাষা প্রথমে একই ভাষার দু'টি উপভাষা ছিল, পরে ক্রমে বঙ্গদেশ ও আসামের ভাষার আঞ্চলিক পার্থক্য যখন বেড়ে গেল তখন বাংলা ও আসামের আঞ্চলিক রূপ দু'টিকে পৃথক্ ভাষারূপে চিহ্নিত করা হল—বাংলা ভাষা ও অসমিয়া ভাষা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একই ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক রূপের পার্থক্যকে কোন্ স্তর পর্যন্ত উপভাষা বলা হবে, এবং এই পার্থক্য বাড়তে-বাড়তে কোন্ স্তরে এলে সেগুলিকে আর উপভাষা বলা যাবে না, সেগুলি হয়ে উঠবে স্বতন্ত্র ভাষা? বস্তুত এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই।

৬৬। Pei, Mario A. and Gaynor, Frank: *A Dictionary of Linguistics*, London: Peter Owen, 1970, p. 56.

কেউ-কেউ বলেছেন, ভাষার আঞ্চলিক রূপ যখন স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীর ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠবে তখন সেগুলিকে আর উপভাষা না বলে ভাষার মর্যাদা দিতে হবে। যেমন—বাংলা ও আসামের ভাষা। কিন্তু এই মানদণ্ড অনুসরণ করলে পূর্ববাংলা (বাংলাদেশ) ও পশ্চিমবাংলা (ভারত)-এর উপভাষাকে দু'টি স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা দিতে হয়। অথচ পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার ভাষাকে তো আমরা স্বতন্ত্র ভাষা বলি না, একই ভাষার দু'টি উপভাষা বলি। তাহলে বলতে হবে, দু'টি জনগোষ্ঠী যখন সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথক্ হবে তখন তাদের আঞ্চলিক ভাষা স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা পাবে। যেমন আসাম ও বাংলার জনগোষ্ঠী সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথক্, কিন্তু পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার জনগোষ্ঠী সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথক্ নয়, তাদের একই সংস্কৃতি—বাঙালীর সংস্কৃতি। এখানে মনে রাখতে হবে আবার সাংস্কৃতিক পার্থক্যের ব্যাপারটিও অনেকটাই আপেক্ষিক ; কারণ বাংলা ও আসামের সংস্কৃতির মধ্যেও কিছুটা ঐক্যসূত্র আছে, অন্যদিকে পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতিতেও কিছুটা পার্থক্য আছে। আবার ভাষাও তো সংস্কৃতিরই একটা অঙ্গ। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়াই ভালো যে, ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পার্থক্যটি চূড়ান্ত কিছু নয়, আপেক্ষিক মাত্র। এই আপেক্ষিকতার কথা মনে রেখেও কেউ-কেউ বলেছেন, একই ভাষাভাষী এলাকার অন্তর্গত একাধিক অঞ্চলের ভাষার আঞ্চলিক রূপের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত পারস্পরিক বোধগম্যতা (mutual intelligibility) থাকে ততদিন ঐ আঞ্চলিক রূপগুলিকে বলা হবে উপভাষা (dialect)। যখন এই আঞ্চলিক রূপগুলি পৃথক্ হতে-হতে পারস্পরিক বোধগম্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তাদের স্বতন্ত্র ভাষা বলা যায়। কিন্তু এই মানদণ্ডও সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। বাংলা ভাষারই দু'টি উপভাষা রাঢ়ী ও চট্টগ্রামীর মধ্যে পারস্পরিক বোধগম্যতা প্রায় নেই বললেই চলে। চট্টগ্রামের বাঙালী দ্রুত কথা বলে গেলে পশ্চিমবাংলার বাঙালী কিছুই বুঝতে পারবে না ; তার চেয়ে সে বরং বুঝতে পারবে অসমিয়া ভাষায় রেডিও সংবাদ। আদর্শ বাংলা ও আদর্শ অসমিয়ার (Standard Assamese) মধ্যে পারস্পরিক বোধগম্যতা বরং বেশী। তবু অসমিয়া ও বাংলা দু'টি পৃথক্ ভাষা, কিন্তু বাংলা ও চট্টগ্রামী একই ভাষার দু'টি উপভাষা। আরো মনে রাখতে হবে যে, এই পার্থক্যও মোটামুটি ধরনের পার্থক্যই। কারণ বোধগম্যতার তারতম্য হয় অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিভেদে, আর বোধগম্যতা ব্যাপারটিও অনেকক্ষেত্রে subjective। সাধারণত দেখা যায়, ভাষা একটি বৃহৎ অঞ্চলে প্রচলিত, উপভাষা অপেক্ষাকৃত

ক্ষুদ্র অঞ্চলে প্রচলিত। ভাষার একটি সর্বজনীন আদর্শ (standard) রূপ থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা নিজের-নিজের অঞ্চলে ঘরোয়া কথায় (informal discourse) আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করে, কিন্তু সাহিত্যে, শিক্ষায়, আইন-আদালতে, বক্তৃতায়, বেতার-সংবাদপত্রে আদর্শ ভাষা ব্যবহার করে। এরকম ভাবে প্রায়ই দেখা যায় একটি আদর্শ ভাষার (Standard Language) এলাকার মধ্যে একাধিক উপভাষা প্রচলিত। উপভাষায় সাধারণত লোকসাহিত্য রচিত হয়। আধুনিক কালে শিষ্ট সাহিত্যে যে বেশী করে উপভাষার ব্যবহার দেখা যায়, সেটা বস্তুত আঞ্চলিক লোকজীবনকে জীবন্তভাবে তুলে ধরার জন্যেই। উপভাষাগুলিতে সাধারণত উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বিশেষ রচিত হয় না, তেমনি এগুলির কোনো ব্যাকরণও সাধারণত লিখিত হয় না। সম্প্রতি উপভাষা সমীক্ষা ও উপভাষার ব্যাকরণ রচনার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কোনো উপভাষায় স্বতন্ত্র সাহিত্য চর্চা ও তার ব্যাকরণ রচনার সচেতন প্রয়াস যখন সংঘটিত হয় তখন তা ক্রমে ভাষার মর্যাদা লাভ করতে থাকে। এই প্রচেষ্টা ভারতে ভোজপুরী ও অন্যান্য কোনো-কোনো ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। এইভাবে ক্রমে তা স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হলে তা স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা লাভ করে।

অঞ্চলভেদে যেমন একই ভাষার মধ্যে অল্পস্বল্প পার্থক্য হয়, তেমনি সামাজিক স্তরভেদেও একই ভাষাভাষী লোকেদের কথায় অল্পবিস্তর পার্থক্য হতে পারে। একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, একজন অধ্যাপক, একজন উকিল, একজন রাজনৈতিক নেতা, একজন শ্রমজীবী এবং একজন দাগী অপরাধী গুণ্ডার ভাষার উচ্চারণে ও শব্দ ব্যবহারে বেশ পার্থক্য চোখে পড়ে। একই ভাষার মধ্যে সামাজিক স্তরভেদে এই যে পার্থক্য একে সামাজিক উপভাষা (Social dialect) বলতে পারি। আবার সমাজে ইতরজনের, মস্তানদের অপরাধ-জগতের মানুষের ভাষাও অনেকটা আলাদা। সমাজের ইতরশ্রেণী ও অপরাধীদের মধ্যে গোপন সাঙ্কেতিক ইঙ্গিতপূর্ণ যে ভাষা প্রচলিত থাকে তাকে অপার্থ ভাষা (Cant) বা সঙ্কেতভাষা (Code Language) বলে। যেমন—

"গণেশ যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'পটাশদার কোনো দোষ নেই। যত দোষ ওই বদে শালার। ও-ই পটাশদাকে ডেকে অপমান করেছে। বাপ তুলে খিস্তি দিয়েছে। আমি শুনেছি। পটাশদা তাই মাঝরাতে বড়খোকা ঝেড়ে দিয়েছে দু'খানা—

'বড়খোকা কি ?'

'জানেন না ? ছ্ছোও ! এই যে সাইজ—' ডান হাতের পাঁচ আঙুলের মুদ্রায় একটা গোলাকার বস্তুর রূপ ফুটিয়ে তুলল গণেশ।" (—ডঃ তপোবিজয় ঘোষ : 'কাল-চেতনার গল্প', ১ম খণ্ড, একটি মস্তানী গল্পের ভূমিকা)।

—এখানে 'বোমা' অর্থে 'বড় খোকা' কোনো-কোনো জায়গার অপরাধ-জগতের সঙ্কেতপূর্ণ ভাষার নিদর্শন।

এরকমের গোপনে ব্যবহারের প্রয়োজনে সৃষ্ট সঙ্কেত-শব্দ বা সঙ্কেত-ভাষা ছাড়াও ইতর বা অভদ্র জনের মধ্যে এমন কিছু শব্দ ও শব্দগুচ্ছ প্রচলিত থাকে যার ব্যবহার সমাজের শিক্ষিত ভদ্রজনের মধ্যে নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হয়। একে **ইতর শব্দ** (Slang) বলে। যেমন—মাল খাওয়া (মদ্য পান করা), বাঁশ দেওয়া (গোপনে পরের ক্ষতি করা), ল্যাঙ্ দেওয়া (গোপনে পরের ক্ষতি করে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত করা), চাম্চে (পরের তোষামোদকারী বা অনুগামী), বড়ি ফেলা (ঘুমানো বা শুয়ে পড়া) আলুর দোষ (অবৈধ প্রণয়ের দিকে ঝোঁক) ইত্যাদি। ইতর শব্দ কিছুদিন ব্যবহারের পর ক্রমশ ভদ্রসমাজেও স্থান পায়, তখন আর তা ইতর শব্দ থাকে না। যেমন—হাতানো (আত্মসাৎ করা) ইত্যাদি।

ভদ্র-ইতর নির্বিশেষে সর্বসাধারণের দ্রুত উচ্চারণ ও ব্যবহারের সুবিধার জন্যে অনেক সময় কোনো বড় শব্দের অংশবিশেষ কেটে বাদ দিয়ে শুধু তার একটা অংশকেই গোটা শব্দের অর্থে ব্যবহার করা হয়। একে **খণ্ডিত শব্দ (Clipped Word)** বলে। এমন প্রয়োগ চলিত ভাষাতেই বেশী হয়ে থাকে। যেমন—মিনি (Minimum), ম্যাক্সি (Maximum), এন্থু (Enthusiasm), কং-ই (কংগ্রেস-ই), মাইক (মাইক্রোফোন), ফোন (টেলিফোন), কংগ্রাট্ (Congratulation) ভেজ্ (Vegetarian) ইত্যাদি।

এরকম দ্রুত ব্যবহারের সুবিধার জন্যে অনেক সময় আবার একাধিক শব্দে গঠিত একটি নামকে বা পদগুচ্ছকে এমন ভাবে ছোট করা হয় যে তাতে শুধু একটিমাত্র শব্দের অংশবিশেষ নেওয়া হয় না, একাধিক শব্দের প্রথম বর্ণ বা অক্ষরটি নিয়ে সেগুলি যোগ করে একটি শব্দই গড়ে তোলা হয়। একে **মুণ্ডমাল শব্দ (Acrostic Word)** বলে। যেমন—ওয়াব্কুটা=WBCUTA (West Bengal College and University Teachers' Association), ইউনেস্কো=Unesco (United Nations Education Scientific and Cultural Organisations), নেফা=Nefa (North-Eastern Frontier Area), তদেব (তৎ+এব=ibid. <ibidem), দপ্ডে (দরকার পড়লে

ডেকো), সি পি এম=CPM (Communist Party Marxist) ইত্যাদি। এরকমের প্রয়োগ সাধু ও চলিত ভাষা এবং উপভাষা সর্বক্ষেত্রেই চলে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে একই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষার নানান্তর, নানা পার্থক্য থাকে—ভাষার রূপ জটিল ও বিচিত্র। একটি সমাজে ভাষার এইসব জটিল রূপকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণী-বিভক্ত করেছেন ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুম্‌ফিল্ড্—

(১) আদর্শ সাহিত্যিক ভাষা (literary standard), (২) আদর্শ চলিত ভাষা (colloquial standard), (৩) প্রাদেশিক আদর্শ ভাষা (provincial standard), (৪) ইতরজনের ভাষা (sub-standard), (৫) আঞ্চলিক উপভাষা (local dialect)।

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে ব্লুম্‌ফিল্ডের এই শ্রেণীবিভাগ পুরোপুরি গ্রহণীয় নয় এবং সব ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন—বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে আদর্শ চলিত ভাষা ও প্রাদেশিক আদর্শ ভাষা—এরকম দু'টি শ্রেণী বিভাগের উপযোগিতা নেই।

যাই হোক, ভাষার যে এত বিচিত্র রূপ ও স্তরভেদ তার সবগুলি সম্পর্কে সমান গবেষণা হয়নি। সামাজিক উপভাষা সম্পর্কে গবেষণা আধুনিক কালে কিছু-কিছু হয়েছে, কিন্তু সে আলোচনা পূর্ণাঙ্গ নয়; তা এখনো বিস্তৃত গবেষণার অপেক্ষা রাখে। আঞ্চলিক উপভাষার দিকেই ভাষাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি বেশী আকৃষ্ট হয়েছে এবং প্রায় সব দেশের আঞ্চলিক উপভাষার একটা মোটামুটি চিত্র এখন রচিত হয়েছে।

অঞ্চলভেদে একই ভাষার মধ্যে পার্থক্য হওয়ার ফলে ভাষার আঞ্চলিক রূপভেদ প্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় Attic-Ionic, Arcadian-Cyprian, Aeolic, Doric প্রভৃতি আঞ্চলিক উপভাষা ছিল। হোমরের মহাকাব্যেও Ionic ও Aeolic উপভাষার পরিচয় রয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাতেও আঞ্চলিক পার্থক্য গড়ে উঠেছিল। তখনকার তিনটি প্রধান উপভাষা ছিল: উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে 'উদীচ্য', মধ্য ভারতে (আধুনিক দিল্লী-মীরাট অঞ্চল) 'মধ্যদেশীয়' এবং পূর্বভারতে 'প্রাচ্য'। সম্ভবত আরো একটি উপভাষা ছিল—'দাক্ষিণাত্য'।[৬৭] মধ্যভারতীয় আর্যভাষায়ও প্রথমে চারিটি প্রধান উপভাষা ছিল—উত্তর-পশ্চিমা, দক্ষিণ-পশ্চিমা, মধ্যপ্রাচ্যা

৬৭। Chatterji, Dr. Suniti Kumar: *Indo-Aryan and Hindi*, Calcutta: Firm K. L. Mukhopadhyay, 1969, p. 60,

Scanned with CamScanner

এবং প্রাচ্য। পৃথিবীর আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যেও আঞ্চলিক রূপভেদ কম নয়। পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা ইংরেজীর দুই প্রধান রূপ—ব্রিটিশ ও আমেরিকান। ব্রিটিশ ইংরেজীও সর্বত্র একরকম নয়—তাতেও উত্তর ও দক্ষিণের দুই প্রধান উপভাষাগত রূপ—Northern English ও Southern English। জার্মান ভাষায় আঞ্চলিক পার্থক্য আরো বেশী। জার্মানভাষার উপভাষাগুলি সংখ্যায় এত বেশী যে এগুলিকে আলোচনার সুবিধার জন্য মাত্র তিনটি প্রধান গুচ্ছে ভাগ করা হয়—উচ্চ-জার্মান গুচ্ছ, (Upper German Group), পশ্চিম-মধ্য জার্মান গুচ্ছ (West Middle German Group), পূর্ব-মধ্য জার্মানগুচ্ছ (East Middle German Group)। এই প্রত্যেক গুচ্ছে রয়েছে একাধিক উপভাষা। দক্ষিণ জার্মানীর দু'টি উপভাষা Alemanic (Alemanisch) ও Bavarian (Bairisch) নিয়ে উচ্চ জার্মান গুচ্ছ রচিত। Alemanic-এর দু'টি ভাগ—High Alemanic ও Low Alemanic। আবার High Alemanic উপভাষারই তিন অঞ্চলে তিন নাম ঃ সুইজারল্যাণ্ডে Schwyzertütsch, জুরিখে Züritüütsch আর বের্ণে Bärndütsch। পশ্চিম-মধ্য জার্মান গুচ্ছেও অনেকগুলি উপভাষা; একে High Franconian গুচ্ছও বলা হয়। প্রথমত এর দু'টি উপবিভাগ—Upper Franconian ও Middle Franconian। এদের আবার নানা আঞ্চলিক বৈচিত্র্য, আঞ্চলিক নাম। জার্মান ভাষার সর্বপ্রধান উপভাষাগুচ্ছ —উত্তর জার্মানীর East Middle German Group। এই গুচ্ছেও অনেকগুলি উপভাষা রয়েছে। ক্লপস্টক, লেসিং, হের্ডার, গ্যেটে, শীলার প্রভৃতির সাহিত্যসৃষ্টি এই উপভাষারই মূল কাঠামোকে অবলম্বন করে রচিত। এই উপভাষাগুচ্ছেরই অন্তর্গত হ্যানোভার-কেন্দ্রিক ভাষা হল আধুনিক আদর্শ জার্মান (Standard German) ভাষার মূল ভিত্তি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় সব ভাষায়ই রয়েছে নানা আঞ্চলিক বৈচিত্র্য—আঞ্চলিক উপভাষা। বাংলাভাষায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলা ভাষারও প্রধান পাঁচটি উপভাষা রয়েছে। বাংলার পাঁচটি প্রধান উপভাষা ও সেগুলির অবস্থান মোটামুটি এই রকম ঃ—

Scanned with CamScanner

উপভাষা	অবস্থান
রাঢ়ী	মধ্য-পশ্চিমবঙ্গ (পশ্চিম রাঢ়ী—বীরভূম, বর্ধমান, পূর্ব বাঁকুড়া। পূর্ব রাঢ়ী—কলকাতা, ২৪-পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী, উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ)।
বঙ্গালী	পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ (ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম)।
বরেন্দ্রী	উত্তরবঙ্গ (মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা)।
ঝাড়খণ্ডী	দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ (মানভূম, সিংভূম, ধলভূম, দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর)।
কামরূপী বা রা জবংশী,	উত্তর-পূর্ব বঙ্গ (জলপাইগুড়ি, রংপুর, কুচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা)।

চিত্র নং ৫৭ : বাংলা উপভাষার অবস্থান

এক-একটি উপভাষার অভ্যন্তরেও আবার নানা আঞ্চলিক পার্থক্য গড়ে উঠতে পারে। এই রকম এক-একটি উপভাষার (dialect) মধ্যেও যে নানা আঞ্চলিক পৃথক রূপ গড়ে উঠে তাকে বিভাষা (sub-dialect) বলে। বাংলার উপভাষাগুলির মধ্যে রাঢ়ী ও বঙ্গালীর বিস্তার খুব বেশী। এই জন্যে রাঢ়ী ও বঙ্গালী দুইয়ের অভ্যন্তরে একাধিক বিভাষা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের প্রধান উপভাষা (dialect) রাঢ়ী। যদিও মোটামুটিভাবে রাঢ়ীর দু'টি প্রধান বিভাগ—পূর্ব ও পশ্চিম, তবু সূক্ষ্ম বিচারে রাঢ়ীর বিভাগ ৪টি। এগুলি হল : (ক) পূর্ব-মধ্য (east central) : কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা, হাওড়া। (খ) পশ্চিম-মধ্য (west entral) : পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব বীরভূম, হুগলী, বাঁকুড়া। (গ) উত্তর-মধ্য (north central) : মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, দক্ষিণ-মালদহ। (ঘ) দক্ষিণ-মধ্য উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা (ডায়মণ্ড হারবার)।—

পূর্বে বঙ্গালীর দু'টি বিভাষা ছিল—(ক) বিশুদ্ধ বঙ্গালী (ঢাকা,

ফরিদপুর, মৈমনসিংহ, বরিশাল, খুলনা, যশোহর এবং (খ) চাটিগ্রামী (চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী)। এখন এই দু'টি বিভাষার মধ্যে পার্থক্য এত বেশী যে চট্টগ্রামের উপভাষা ঢাকার লোকে প্রায় বুঝতেই পারে না। এখন এ দু'টিকে স্বতন্ত্র উপভাষা, ধরাই ভাল।

Scanned with CamScanner